ত্রয়োদশ অন্তর্জাল সংখ্যা :: ১০ই বৈশাখ, ১৪২৮ / 24.04.2021

"নির্ভরতা যতই তোমার আসবে, ততই আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদাবোধ বাড়বে এবং ততই তুমি ভয়শূন্য হয়ে উঠবে।"

- শ্রী প্রীতিকুমার

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

-: সূচীপত্র :-

আমাদের লক্ষ্য	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
'My Saviour'	নীরেন মৈত্র
সনাতন গোস্বামীর অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপ চৈতন্য
আজকের বাংলা সাহিত্য ও স্বামী বিবেকানন্দ	ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ
পার্থসারথির প্রতি	প্রণব রায়
নববর্ষের কথা	সুনন্দন ঘোষ
আমাদের কথা	সম্পাদকীয়

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-zine by
Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.
Website : https://www.parthasarathipatrika.com
Contact : 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

আমাদের লক্ষ্য **শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ**

জন্মান্তরের ধারায় অবগাহনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতায় উত্তরণের সাধনা মানবের। পূর্ণতা-যা আপনাকে জানার মধ্যে, পূর্ণতা-যা আপনার অন্তরতরে সেই পরমকে পাওয়ার মধ্যে। সেই সার্থকতার তীর্থে উপনীত হওয়ার মহান শক্তি দান করে-আত্মকেন্দ্রিকতা নয় আত্মবিস্তার। কারণ উপনিষদ বলেছেন-"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম"- "এই যাহা কিছু চরাচর বস্তু দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া স্পন্দিত হইতেছে।" তাই আপন অন্তরে সেই পরম পুরুষের অলক্ষ্য আগমনকে সূচিত করার পথ কর্মমুখর মহাবিশ্ব জীবনের নন্দন স্পন্দন ছন্দে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে আত্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ করে তোলা। তার জন্য প্রয়োজন আত্মনিবেদন, তৎপূর্বে আত্মপ্রস্তুতি। মানব জীবনের ভিত্তি ধর্ম, যা আমাদের উত্তীর্ণ করে উচ্চতর চেতনায়, দান করে আত্মশুদ্ধি-আত্মশক্তি। এবং ধর্মের মূল একক প্রেম। প্রেম ও শ্রদ্ধার সমন্বয়ে জাত সেবা ও ত্যাগের মহিমায় উদ্বোধিত করে তুলতে হবে ব্যষ্টি জীবন ক্রমে সংসার, সমাজ, দেশ। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে মানবের সেবায়। ঈশ্বরের নীরব অবস্থানকে প্রত্যক্ষ করতে হবে মানব জীবনের দেহ মন্দিরে অধিষ্ঠিত অন্তরাত্মায়। জীবের প্রতি প্রেমময় সশ্রদ্ধ সেবার অভিব্যক্তিতেই তাঁর সার্থক আবাহন। ক্ষুধার্তের আহার্য সংগ্রহ, নিরাশ্রয়ের আবাস সংস্থান, অজ্ঞানতার আবর্তে অবগাঢ় মানবের অন্তরে চেতনার সঞ্চার-তাঁরই পূজার রূপভেদ মাত্র।

DO NOT COPY

প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে প্রাত্যহিকতার কোন গ্লানি কোন মালিন্য যেন স্পর্শ না করে আমাদের হৃদয়কে। যে সমদর্শিতা যে সহমর্মিতা আমাদের পথ নির্দেশক–তাকে রক্ষা করতে হবে অমেয় সতর্কতায়। মনে রাখতে হবে ত্যাগ না থাকলে সেবায় পূর্ণতা আসে না। মনে রাখতে হবে অর্জিত ঋদ্ধির কল্যাণকর প্রয়োগেই সিদ্ধির সার্থকতা।

অমৃতের পুত্র আমরা। অপ্রতিহত গতির প্রাবল্যে সকল প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করে আমাদের জয়যাত্রা–আলোকের দিকে–অসীমের দিকে–আমাদের সিদ্ধি অনিবার্য।

জয়তু পার্থসারথি!

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

শ্রীশ্রীতিকুমারের পত্রাবলী যখন ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে সেই সময় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ প্রায় সকলের মধ্যেই ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত যে জীবন ধারার আমি দর্শক, তা এত গভীর ও ব্যাপক যে অস্থির মানসিকতা নিয়ে সমস্ত ঘটনাবলীকে সাজিয়ে প্রকাশ করা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই যখন যা মনে পড়ে তাই উল্লেখ করি। যদি কখনও আমার মানসিক সমতাবোধ ফিরে আসে তখন গুছিয়ে লিখবার আশা রাখি। এই আশা নিয়েই এ জীবন।

যে বয়সে মায়ের আঁচলের তলায় থাকা উচিৎ সে বয়সে হারিয়েছি মা'কে। প্রাক–বিবাহ কালে বাবাকে ছেড়ে কি করে থাকব ভেবে কোনও কূলকিনারা পেতাম না। বিয়ে হয়ে যাবার পর বাবাকে ছেড়ে থাকাও অভ্যাস হয়ে গেল। যতদিন যায় স্বামী আপন হতে থাকেন। তখন আবার তাঁর অনুপস্থিতি

DO NOT COPY

চিন্তা না করবারই কথা। কিন্তু ততদিনে এসে গেছে সুনন্দন। আবার ভাবনা-চিন্তা, স্নেহ-ভালবাসার পট পরিবর্তন। সেই নন্দন বড় হল, স্বাধীন চিন্তাধারা হল। নিজের পথ নিজে বেছে নিতে শিখল। সেও আর আমার রইল না। এল জুনকো। দশ দিনের বাচ্ছাটিকে বুকে তুলে নিলাম। মনে হল সারা পৃথিবী একদিকে, জুনকো আরেক দিকে। সেই জুনকোও একদিন আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেল। তাওতো সহ্য করলাম। একটা সত্য বুঝে নিলাম – এই মানব জীবনে সহনশীলতার চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

অথচ এই সহনশীলতার প্রতীক ছিলেন শ্রীপ্রীতিকুমার। তা নয়ত আমার মত এইরকম একটি সোচ্চার মহিলার সঙ্গে দীর্ঘ তিরিশ- একত্রিশ বছর সংসার করা চাট্টিখানি কথা নয়। কিছুদিন আগে কিশোরকে বলেছিলেন, "কোনও কথার যদি Publicity-র দরকার হয় তাহলে কথাটি শুধু তোমার মামীমার কানে তুলে দিয়ো।"

আমার গৃহে উপস্থিতি বুঝতে প্রতিবেশীদের কখনও অসুবিধা হয়নি। একবার N.C.C. Camp-এ গেছি। পাশের বাড়ীর কর্তা শ্রীপ্রীতিকুমারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "দাদা, বৌদি কি অসুস্থ? হাসপাতালে আছেন না কি?" শ্রীপ্রীতিকুমার ঝটিতি জবাব দিয়েছিলেন, "আজ্ঞে না। Camp-এ গেছেন। আজ রাত্রে ফিরবেন। কাল সকাল থেকে গলা পাবেন।"

আমাকে কতবার বলেছেন নীচুস্বরে কথা বলতে। হৈ হৈ না করতে। আমিও বলে বসেছি, "আস্তে কথা বলব কেন? আমি কি চুরি করেছি?" তিনি বলতেন, "আমার কাছে যদি টাকা পয়সা থাকে, আমার স্ত্রী জানলে আর রক্ষা নেই। সারা মহল্লার লোক টের পেয়ে যাবে।" তাই কখনও আমাকে কোন গোপন কথা বলতেন না। আমিও জানতে চাইতাম না, বলে ফেলবার ভয়ে। অথচ এখন প্রতিদিন সকাল থেকে আমাদের বাড়িটাতে কি ভীষণ নীরবতা বিরাজ করে। আমার আফশোষ হয় তিনি থাকতে কেন এত কথা বলতাম! আবার আমার নীরবতাও তাঁর ভাল লাগতো না। খুব বেশী রাগ হলে আমি একদম চুপ করে থাকতাম। বাড়ি ঢুকেই আমাকে নীরব দেখলে বাপীকে জিজ্ঞাসা করতেন

– “বাবু, আজ কি ব্যাপার? খুব চুপচাপ মনে হচ্ছে। সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটে গেছে নাকি?” তারপর থেকেই নানাভাবে চেষ্টা করতেন আমাকে হাসাতে। ভাবখানা ছিল আমি না হাসলে দুনিয়া অচল হয়ে যাবে। আমিও পৃথিবীর সেরা নির্লজ্জা মহিলা। একটু সাধলেই গলে জল হয়ে যেতাম।

এই দোল পূর্ণিমার সময় ওঁর কথা খুব মনে পড়ছিল। বিয়ের পর দেখেছি কি উৎসাহ নিয়ে হোলি খেলতেন। আমার বাবাও খুব আমুদে লোক ছিলেন। একবার দোলের সময় আমরা কাটিহারে ছিলাম। স্বশুর-জামাই মিলে কি রঙ মাখাবার ঘটা। যে কয়জন বাঙ্গালী পরিবার ক্যালকাটা ম্যাচ ওয়ার্কসে কাজ করতেন, তাদের কাউকে ছেড়ে দেননি। কি আনন্দে ছিলেন সেই সময়। কলকাতায় ফিরে আবার যে কে সেই। ভক্তরা আসতেন পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করতে। শান্তভাবে তাদের কপালে আবীরের টিপ পরিয়ে দিতেন। আমাদের কখনও নিষেধ করেন নি রঙ খেলতে। এই দিনটা আমরা ভীষণ ভাবে হৈ হৈ করতাম। গত ১৯৮৭ সাল থেকে আমরা আর রঙ মাখি না। বিকেলে দু-চারজন আসেন তাদের দাদার পায়ে আবীর দিতে। ছবিতে আবীর নিবেদন করে চলে যান। আমারও আর ইচ্ছে করেনা রঙ হাতে নিতে। ইশ্বর বোধহয় ঘটনা ঘটবার সাথে সাথে মানুষের মনকেও তৈরী করে দেন।

বাড়ীতে থাকাটা পছন্দ ছিল না। প্রতিদিনই শ্যামবাজারে যেতেন ১১টা–১২টা নাগাদ। ফিরতে রাত দশটা-সাড়ে দশটা। শনিবার, রবিবার ছিল না। ছুটির দিন বলে কিছু ছিল না। ১৯৭৩ সাল থেকে আমি ও বাপী কিছুদিন বারাসতের বাড়িতে থাকা আরম্ভ করি বাড়ি দেখাশুনা করবার জন্য। সেই সময় থেকে রবিবার দিনটা আমাদের সঙ্গে কাটাতেন। বারাসতে রবিবার রবিবার সিনেমাও দেখতে যেতেন। কি দেখতেন জানিনা; মোটকথা পাঁচ মিনিট অন্তর বাইরে গিয়ে সিগারেট খেয়ে আসতেন। একবার ‘ধর্মাত্মা’ নামে একটি সিনেমার টিকিট কাটা হয়েছিল। ওনাকে বোঝান হয়েছিল সিনেমাটা ধর্মমূলক। সেই সিনেমা দেখতে গিয়ে আমারই চক্ষু চড়কগাছ। আমি আর তারপর নামকরণের সার্থকতা

ব্যাখ্যা করতে পারিনা। আর একবার দেখতে গেলাম 'মেরা বচন গীতা কি কসম।' সেখানেও গীতার ব্যাখ্যা করতে পারিনি। সম্ভবতঃ ঐ সিনেমাটারই মধ্যাহ্ন বিরতির ঠিক আগে নায়ক-নায়িকার যেইমাত্র বিয়ে হয়েছে, শ্রীপ্রীতিকুমার বলে উঠলেন, "চল বাড়ি যাই। বিয়ে তো হয়ে গেল।" – এমনই ছিল তাঁর সিনেমা দেখা।

বরানগরের বাড়িতে থাকাকালীন নিজে বাজার যেতেন সাইকেলে চড়ে। প্রতিদিন যাওয়া চাই। তাঁর ফরমাশ মত রান্না করতে আমার ঘাম ছুটে যেত। যখন বাজারে যেতে পারতেন না, তখন যে যেত, তাকে বলে দিতেন কি কি খাবেন। অথচ যেদিন বলতাম, "আজ পারব না বেশী কিছু করতে, আমার খুব তাড়া আছে," সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠতেন, "যা হবে তাই, আমার কোনও আপত্তি নেই।" অথচ শেষ দিন পর্যন্ত বকর বকর করলেও আমি তাঁর আহার সম্বন্ধে কোনও সাধ অপূর্ণ রাখিনি। এখনও আমি সেই অভ্যাসটা বজায় রেখেছি নিবেদন করবার।

উনি ছিলেন ভীষণ শৃঙ্খলাপরায়ণ। না বলে কোথাও যাবার উপায় ছিল না। দেরী হলে ফোন করে দিতে হতো, না হলে টেবিলে লিখে রেখে যেতে হতো। একবার বরানগর থেকে গ্লোব সিনেমা হলে "Tora Tora Tora" দেখতে গেছিলাম। ফেরার পথে কি ভীষণ বৃষ্টি। কোনও মতে একটি ট্যাক্সি করে কলেজ ষ্ট্রীট পর্যন্ত এসে, পারিজাতবাবুর বাড়ি থেকে ওঁকে শ্যামবাজারে ফোন করেছিলাম যেতে পারছি না বলে। রাত্রিটা ওখানে থেকে যাব কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। পারিজাতবাবুর পরিবারের সাথে আমাদের যে নিকট সম্পর্ক ছিল তাতে একটি রাত কাটান যেত। শ্রীপ্রীতিকুমার বললেন, "আমি শ্যামবাজারে অপেক্ষা করছি। এখানে চলে এস, একসাথে বাড়ি ফিরব।" সেদিনের প্রবল বর্ষণে বাস ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছিল। শ্যামবাজারে কোনমতে পৌঁছালেও সেখান থেকে আর গাড়ি পাইনি। বাপীর তখন ১৩-১৪ বছর বয়স। আমরা প্রায় হাঁটু জলের ভিতর দিয়ে রাত দেড়টার সময় বরানগরের বাড়িতে ফিরেছিলাম বিটি রোড ধরে সকলে মিলে

পায়ে হেঁটে। তারপর বর্ষাকালে আর কোনও দিন ইভনিং শোতে মেট্রো, লাইট হাউসে সিনেমা দেখতে যাইনি।

সকালে হয়ত বাপী আগে খেয়ে নিত তার স্কুলের সময়ানুযায়ী। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া একসাথে করা চাই।

বরানগরের বাড়ি দোতলা হবার পর আমরা অতিথিদের কাছে একটু আধটু মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। অতিথিরা সাধারণতঃ কোনও দিন আমাদের সময়মত আসেননি, নিজেদের সুবিধে মত এসেছেন। ১৯৭৭ সাল থেকেই শ্রীপ্রীতিকুমার অসুখে পড়েন। তাঁর 'ডায়াবেটিস' রোগ ধরা পড়ে। শরীর খারাপ হতে থাকে। কারও সাথে কথা বলতে ইচ্ছে না করলে বাচ্চা ছেলের মত দোতলার ঘরে বসে থাকতেন। আমরা বলতাম তিনি বাড়ি নেই। কিন্তু কিছু কিছু 'শাহেনসা' ছিলেন যারা অপেক্ষা করতে করতে দোতলায় উঠে যেতেন। সেসময় সামাল দিতে আমি বেসামাল হয়ে যেতাম।

দমদমের বাড়িতে আসার পর আমাদের জীবনের শান্তি চলে গেছিল। আমি আর বাপী আবিষ্কার করেছিলাম ফ্ল্যাটটা বাস রাস্তার পাশে বলে অতো লোক যে কোন সময় যে কোন জায়গা থেকে এসে পড়তে পারেন। একটাই ফ্লোর ছিল বলে এখানে তাঁকে এক মিনিটের জন্য লুকোতে পারিনি। এ বাড়িতে আসাই হল আমাদের কাল। মানসিক শান্তিও বিঘ্নিত হয়েছিল। ফ্ল্যাট কেনবার সময় যে দাম দিতে হয়েছিল তা ছিল বরানগরের বাড়ির প্রায় দ্বিগুণ। ব্যবস্থা করতে যাকে টাকা দিয়েছিলেন – সেই তৎকালীন নিকটাত্মীয় ব্যক্তি আসল টাকা ফেরৎ দেয় নি, বস্তুতঃ শ্রীপ্রীতিকুমারের সাথে জোচ্চুরী করেছিল। দিনের পর দিন শ্রীপ্রীতিকুমারকে হয়রান করেছে, ফলে তিনি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ভদ্রতাবোধের জন্য ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি টাকা তো ফেরৎ দেয়ই নি, উপরন্তু শ্রীপ্রীতিকুমার দেহরক্ষার পর আমাদের জীবন যে কতভাবে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

শ্রীপ্রীতিকুমারের লেখা ডায়েরী থেকে অনেক হিসেব পাওয়া যায়। সে হিসাব নেবার দায়িত্ব যার তিনি সময় মতই বুঝে নেবেন। আমি শুধু দেখে যাব। আমার আর করবার কি আছে?

কলম ধরলেই আমার একটার পর একটা ঘটনা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেগুলি পরপর সাজিয়ে তোলার মত মানসিক সমতা বোধ এখনও আমার নেই। সে বোধ আসতে আর দেরী নেই। তখন আমি রোজনামচাতে পর পর লিখে যাবার চেষ্টা করব। এখন শুধু শ্রীপ্রীতিকুমারের কথা যখন যে ভাবে মনে পড়ে সেই ভাবে লিখে ফেলি। ত্রুটি মার্জনার দায়িত্ব পাঠকবর্গের।

‘My Saviour’ **নীরেন মৈত্র**

দাদার সাথে আমার দেখা হয় ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে। পার্থসারথির বিজ্ঞাপনের জন্য আমার এক স্কুলের বন্ধু আমাদের Calcutta Chemical Co.-তে আসে আমার সাথে দেখা করতে। আমি ওর কাছে দাদার সম্বন্ধে কিছু শুনে মানে উনি আধ্যাত্মিক পথে আছেন শুনে ওঁকে দেখতে চাইলাম। বন্ধুটি বলল উনি তো সব জায়গায় যান না। বলব যদি আসেন। এর কদিন বাদেই সে দাদাকে আমাদের অফিসে আমার ঘরে নিয়ে আসে।

সত্যি কথা বলতে কি আমি প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। দেখা হতেই মনে হয়েছিল ওঁর সঙ্গে আমার যেন কত দিনের চেনা। উনি যেন আমার একান্ত আপনার জন। মনে হয়েছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণ আমার কাতর প্রার্থনা শুনে ওঁকে পাঠিয়েছেন কারণ তখন সংসার ও কর্মক্ষেত্রে নানারকম অন্যায় ও অবিচারের সাথে আপোষ করতে না পেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আর এর থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ঠাকুরের কাছে

প্রার্থনা করতাম। ওঁকে দেখেই মনে হল উনি ঈশ্বরপ্রেরিত। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর দাদা চলে গেলেন। যাবার আগে আমায় শ্যামবাজারে যাবার কথা বলে গেলেন।

কয়েক সপ্তাহ পরে আমি বাবার (আমার বাবা ছিলেন ক্যালকাটা কেমিকেলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক) কাছ থেকে বিজ্ঞাপনের অনুমতিপত্র নিয়ে শ্যামবাজারে গেলাম। এখনকার শ্যামবাজারের ঘরটির সঙ্গে তখনকার ঘরটির অনেক তফাৎ। তখন ঘরটি বাড়ীর পিছন দিকে ছিল। ছোট একটি ঘর। তাকে পার্টিশন করে দুখানা করা হয়েছে। একধারে একটি ছোট তক্তোপোষ, একটা টেবিল ও চেয়ার। আর পার্টিশানের ওপাশে এখনকার মতই সিংহাসনে মা কালীর ছবি ও শ্রী অরবিন্দ ও শ্রীমার ছবি। সামনে একটি আসন পাতা। এই ঘরে ঢুকতেই একটি শান্তির ভাব আমায় আচ্ছন্ন করে ছিল। এই ঘরেই আমার কিছু অদ্ভুত দর্শন ও অনুভূতি লাভ হয়েছিল ওঁর কৃপায়।

ক্রমশঃ ওঁর সাথে আলাপ ঘনিষ্ঠ হল। আমার উদ্ভ্রান্ত চিত্ত ওঁর সংস্পর্শে এসে ক্রমশঃ শান্ত হয়ে এলো। আমার দিশাহারা চিত্ত আবার তার চলার পথ ফিরে পেল। যে ক্লান্তি আমায় আচ্ছন্ন করছিল, তা দূর হয়ে গেল। আমার কর্মে উন্নতি হল ও কর্মক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে গেল। আমি আবার যেন নতুন করে বাঁচতে শিখলাম।

দাদার কাছে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি অভয়। দিনে দিনে তাঁর নিঃস্বার্থ স্নেহ ভালবাসা ও উপদেশ বাণী আমার কর্মপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ালো। তাঁর তেজোদীপ্ত বাণী আমায় উজ্জীবিত করে তুলেছিল। তিনি নিজে পুরুষকারে বিশ্বাসী ছিলেন। বলতেন, নিজে আন্তরিক চেষ্টা কর তার ফল পাবেই- অযথা অন্যের উপর নির্ভর করার কথা চিন্তা করবে না। নির্ভর যদি করতেই হয় সম্পূর্ণ নির্ভর করবে ঈশ্বরের উপর। বলতেন, “যদি কর্মে সফলতা আনতে চাও ভাগ্যের দোষ দিও না ভাগ্যকে গড়ে তোল তোমার কর্মের দ্বারা। কর্ম করবে পুরুষকার

দিয়ে, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা নিয়ে, ঈশ্বরের উপর পূর্ণভাবে নির্ভর করে। তাহলেই তাঁর কৃপালাভ করবে। তাঁর কৃপা পেলে সব কিছুই সফল হবে।" উনি আমায় লিখেছিলেন, "যা সত্য তাকেই আঁকড়ে থাক শেষ পর্যন্ত। একথা মনে রাখবে সংসার ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং তাঁর লীলাখেলা। সব কিছুকেই মায়া বলে উড়িয়ে দিও না।"

দাদা ছিলেন অন্তর্যামী। উনি আমাদের মনের কথা বুঝতে পারতেন। আমাদের মানে যাদের উনি স্নেহ করতেন তাদের চলার পথে উনি সবসময় দৃষ্টি রাখতেন বিশ্বস্ত প্রহরীর মত। বাড়ীতে বা কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠার অভাব দেখলে উনি তাও বলে দিতেন। কত সময় কত কিছু সঠিক বলে আমায় সতর্ক করে দিয়েছেন। তাতেই বুঝতে পারতাম ওঁর অগোচর কিছুই নেই। ভুল করলে পিতার মত সংশোধন করে দিয়েছেন। সময়ানুবর্তীতাও তাঁর কাছে বিরাট ব্যাপার ছিল। বলতেন যে সময় তুমি নির্দিষ্ট করবে তা রাখতে চেষ্টা করবে। ১৫/২০ মিনিট দেরী হতে পারে রাস্তার জন্য কিন্তু তার বেশী নয়। কারণ আমারও সময়ের দাম আছে। আমি এখানে বসে আছি বলেই তুমি তোমার কথামত সময়ে আসবে না, তা হলে আমার মুশকিল হয়। এ বিষয়ে তাঁর কঠোর নির্দেশ ছিল।

তিনি সিদ্ধ যোগী ছিলেন। আমাদের ভূত ভবিষ্যত দেখতে পেতেন। কত বিপদে তিনি আগাম সাবধান করে দিয়েছেন। তাঁর সক্রিয় সাহায্যে সতত তিনি আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। তাঁর আন্তরিক চেষ্টা ব্যতীত আমাদের সংসার হয়ত ছন্নছাড়া হয়ে যেত। তাঁর কৃপা ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ না থাকলে আমাদের জীবন অন্যরকম হয়ে যেত।

দাদা কারও কাছে অর্থের প্রত্যাশী ছিলেন না। কত লোক তাঁর সহায়তায় বিরাট আর্থিক সাফল্য পেয়েছে কিন্তু উনি তাদের কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য নেন নি। বলতেন আমি ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করি না। ধনী দরিদ্র তাঁর

DO NOT COPY

কাছে সমান ছিল। ধর্মের গোঁড়ামী তাঁর ছিল না। তাই অন্য ধর্মের লোককেও তাঁর কাছে আসতে দেখেছি। তাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে কোন পার্থক্য ছিল না।

সপরিবারে তাঁর সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। সেইসব দিনগুলি আমাদের জীবনের একটি গৌরবময় অধ্যায়। তখন নানা ধরণের গল্প করতেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনতাম। ওঁর জীবন সংগ্রামের কথা, সাধনার কথা, তাঁর জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী তাঁর কাছে শুনে আমরা অভিভূত হয়ে যেতাম। ওঁর বাণীর সঙ্গে ওঁর জীবনযাত্রায় কোন অমিল দেখিনি। স্বামী বিবেকানন্দের Inspired Talks যেমন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তার চলার পথে, দাদার বাণীও সেইরকম উদ্বুদ্ধ করে।

দাদা ছিলেন আমাদের জীবনে Friend Philosopher and Guide। এ কথাটি আক্ষরিক অর্থেই আমাদের কাছে সত্য। তিনি আমাদের বন্ধুর মত ভালবেসেছেন, সাহায্য করেছেন, গুরুর মত কৃপা করে পথ দেখিয়েছেন, আলো দেখিয়েছেন।

দাদা বৌদির স্নেহস্পর্শে ধন্য আমরা। অহেতুক ভালবাসা স্নেহে তাঁরা আমদের জীবনকে ভরিয়ে তুলেছেন। ওঁরা আমদের কাছে কি পেয়েছেন আমি জানিনা, কিন্তু যখনই আমরা তাঁদের কাছে গিয়েছি তাঁদের কাছে পেয়েছি অফুরন্তভাবে তাঁদের ভালবাসা যা আমাদের জীবনে অমূল্য সঞ্চয় হয়ে আছে।

উনি চাইতেন সকলের ধর্মে অনুরাগ হোক। আমরা যারা তাঁর কাছে যেতাম তাদের নিয়ে তাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'পার্থসারথি চক্র'। প্রতিমাসে এক একজনের বাড়িতে অধিবেশন হোত। সেই সব অধিবেশনে প্রতিবার নানা ধর্মপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা বক্তৃতা হত। নানা ধর্ম-বিষয়ক কীর্ত্তন লীলাগীতি হত। এই চক্রের একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ছিল। যেখানে প্রচুর রোগী উপকৃত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থানাভাবে সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এইবার

পূজার আগে আমার সঙ্গে দাদার কথা হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল নূতন করে আবার সব আরম্ভ করা হবে- অন্য কোথাও অসুবিধে হলে দাদার বাড়ীতেই। কিন্তু তা আর পূর্ণ হল না।

পরহিতায় যে জীবন শুরু হয়েছিল তা শেষ হয়ে গেল পরহিতায়। নিজের দিকে কখনও তাকিয়ে দেখেননি তিনি। তাই অকালে চলে যেতে হল তাকে। যাদের তিনি ভালবেসেছিলেন নিঃস্বার্থভাবে, তারা অনেকেই তাঁকে আঘাত দিয়েছেন- সে সব আঘাত তিনি বুক পেতে গ্রহণ করেছেন। অভিযোগ করেন নি। তাই তিনি এই আঘাত নিয়েই চলে গেলেন।

তিনি নিজে বুঝতে না দিলে কে তাঁকে বুঝবে? তাই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে না বুঝলেও যতটুকু বুঝেছি, তাতে বুঝেছি তিনি ছিলেন আনন্দস্বরূপ-প্রেমস্বরূপ। আমি মনে করি তাঁর সাথে আমার কখনও বিচ্ছেদ হবে না। জন্ম-জন্মান্তরেও তাঁর সাথে আমি থাকব কারণ তিনি নিজেই আমাকে তাই জানিয়েছেন। তিনি আমার জন্মদিনে যে আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন তাতে লিখেছেন –

"ঈশ্বর ও আমি তোমাতে যে বিশ্বাস রেখেছি তা যেন জন্ম জন্ম থাকে। আমি তুমি মিলিতভাবে আরও সকলকে নিয়ে ঁমায়ের সকল কর্মে যেন পূর্ণভাবে সহায়তা করতে পারি। .....তোমার প্রেম ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়ে মায়ের দিকে এগিয়ে চলুক এই কামনা করি।"

ইতি-
প্রীতিবদ্ধ শ্রীপ্রীতিকুমার

১৪/১/৭৮

দাদার কথা লিখতে বসলে শেষ হবার নয়। যতই লিখি মনে হয় কিছুই লেখা হল না। তাই আজ কবিগুরুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে এই বলে শেষ করতে চাই-

DO NOT COPY

"তোমার সাথে আমার সম্বন্ধ এই যে তুমি আমাকে দেবে আর আমি নত হয়ে পড়ে তা গ্রহণ করব। প্রার্থনা করি নমস্তেহস্তু-তোমাতে আমার নমস্কার হোক। সুখ আসুক, অপমান আসুক নমস্তেহস্তু। তুমি শিক্ষা দিচ্ছ এই জেনে নমস্তেহস্তু। তুমি রক্ষা করছ এই জেনে নমস্তেহস্তু। তুমি নিয়ত আমার কাছে আছ এই জেনে নমস্তেহস্তু।.....তোমাকে যথার্থরূপে নমস্কার করে চিরদিনের মত পরিত্রাণ লাভ করি।"

"জয়তু দাদা"।

সনাতন গোস্বামীর অলৌকিকত্ব **ব্রহ্মচারী অরূপ চৈতন্য**

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অন্যতম লীলাপার্ষদ ছিলেন সনাতন গোস্বামী। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন বাংলার নবাব হুসেন সাহের দবীর খাস অর্থাৎ একান্ত সচিব। তিনি তখনকার দিনে যে কোন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানের মত ফার্সী ও আরবীতে অনর্গল কথা বলতে পারতেন। কালে তিনি নবাবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। প্রভূত মান যশ এবং বিত্তের অধিকারী হয়ে তৎকালীন সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু তিনি আন্তরিকভাবে এই সকল জিনিষ চান নি। কালে তিনি মহাপ্রভুর অপূর্ব প্রেমধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার কথা জানতে পেরে তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় লাভের জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। মহাপ্রভুও তাঁর মত ভক্তজনের প্রাণের চরম আর্ত্তি লক্ষ্য করে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে তাঁর অন্যতম লীলা পার্ষদরূপে গ্রহণ করেন। সনাতন নবাবের দরবার ত্যাগ করে প্রভূত মান যশ ধনের অভীপ্সা ত্যাগ করে চিরকালের জন্যে শ্রীচৈতন্যের প্রিয় সান্নিধ্য লাভ করেন।

DO NOT COPY

ক্রমে সনাতন মহাপ্রভুর পরম প্রিয় লীলাসঙ্গীতে রূপান্তরিত হন। এই মহাবৈষ্ণব প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখেছেন ভক্ত কৃষ্ণদাসঃ

‘প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ।
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে।
ধর্মাধর্ম বিচার কিবা না পার করিতে।
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন।’

মহাপ্রভু এমন পরম ভক্তকে দিয়ে তাঁর ঈপ্সিত অনেক কাজ করিয়ে নেন। কালে সনাতন গোঁসাইয়ের নানা প্রকার অলৌকিক বিভূতির কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বহু লোক তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে উপকৃত হতে লাগলো।

সেবার বারানসী ধাম থেকে এক বৃদ্ধ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন সনাতনের কাছে। তাঁর বাড়ী বর্ধমান জেলার মানকড়ে। নাম জীবন ঠাকুর। সারা জীবন দারিদ্র্যের জ্বালায় পীড়িত হয়েছেন। এখন বয়স হয়েছে। তাই দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে পারছেন না। এবার যা হয় একটা কিছু গতি ফেরাবার আশায় ধর্ণা দিলেন বারানসীর বাবা বিশ্বনাথের কাছে। কাতর স্বরে বাবার কাছে প্রার্থনা জানালেন জীবন ঠাকুর, বাবা, অনেক দিন ধরে দারিদ্র্যের জ্বালায় ভুগছি। আর এ জ্বালা সহ্য হয় না। এবার কৃপা করে আমাকে এই জ্বালা হতে রক্ষা করুন। আমাকে অর্থ প্রাপ্তির কোন সন্ধান বলে দিন।

রাত্রির শেষ যামে জীবন ঠাকুর বাবা বিশ্বনাথের আদেশ পেলেন, ওরে তুই বৃন্দাবন ধামে চলে যা। সেখানে রয়েছে সনাতন গোঁসাই। তুই তার শরণ নে। তার কাছে রয়েছে মহামূল্যবান রত্ন। সেই রত্ন পেলে তোর চিরদারিদ্র্য জ্বালা দূর হয়ে যাবে।

ঐ আদেশ শোনামাত্র বিন্দুমাত্র দেরী না করে জীবনঠাকুর ছুটে চলে এলেন বৃন্দাবন ধামে। দেখা করলেন সনাতন গোঁসাইয়ের সঙ্গে। তাঁর কাছে বললেন নিজের সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত।

DO NOT COPY

জীবনঠাকুরের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন সনাতন। ভাবলেন আমি তো সন্ন্যাসী, রিক্ত মানুষ। আমি আবার কিভাবে এই ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য দূর করবো। আমার যদি ধন দৌলত থাকতো তাহলে তাই দিয়ে দারিদ্র্য দূর করতে পারতুম। কিন্তু তাতো আর উপায় নেই। আমি রাত দিন আমার ইষ্ট দেবতার ভজন পুজন আর ধ্যান জপ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। সংসারের জাগতিক নিয়ম কানুনের দিকে আমার নিষ্ঠা নেই। তাই আমার পক্ষে এ কাজ কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

এমনি খানিক চিন্তার পর সনাতনের মনে পড়লো পূর্ব দিনের এক ঘটনার কথা। ভাবলেন, তাইতো। আমার সন্ধানে তো একটা অমূল্য রত্ন আছে। তাই দিয়ে এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট ব্রাহ্মণের অভাব দূর হতে পারে।

সনাতনের কাছে একটি অমূল্য রত্ন ছিল। তবে সেটা তাঁর কাছে ছিল না। তিনি বেশ কিছুদিন আগে যমুনার তীরে এই রত্নটি কুড়িয়ে পান।

দেখলেন, সেটি একটি বহু মূল্যবান রত্ন।

রত্ন পেয়ে আদৌ উল্লসিত হলেন না সনাতন। বরং তাঁর মন অনাগত অমঙ্গলের আশঙ্কায় দুলে উঠলো। ভাবলেন, আমি একজন নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী। আমার কি উচিত এই রত্নকে গ্রহণ করা। এর দ্বারা আমার কোন মঙ্গল না হয়ে বরং অমঙ্গলই হবে। তার চেয়ে একে যমুনার জলে বিসর্জন দেওয়া উচিত।

এইভাবে সনাতন রত্নটিকে যমুনার জলে নিক্ষেপ করতে যাবেন এমন সময় তাঁর চিত্তে উদয় হল অন্য এক চিন্তা। ভাবলেন, না, এই রত্নটিকে নদীতে বিসর্জন করা চলবে না। এটি আমার রত্ন নয়, ভগবানের। এ দুনিয়া হচ্ছে তাঁরই রাজত্ব। সুতরাং তাঁর জিনিষকে আমার ফেলার কি অধিকার আছে। হয়তো তিনি আমাকে এই রত্নের সন্ধান দিয়েছেন কোন মঙ্গল কর্মের জন্যে। এর দ্বারা কোন দরিদ্রের দারিদ্র্য হয়তো ঘুচবে।

এইরূপ ভেবে সনাতন রত্নটিকে যমুনার জলে না ফেলে ভজন কুটিরের অদূরবর্তী নদী তীরে পুঁতে রাখলেন।

তারপর বহুদিন চলে গেছে। সনাতনেরও ঐ রত্নের কথা খেয়াল ছিল না।

এবার এই দরিদ্র ব্রাহ্মণটিকে দেখে তাঁর মনে রত্নের কথা প্রকাশ পেল। তিনি ঐ রত্নটিকে ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দিতে মনস্থ করে তাকে মধুর বচনে বললেন, বাবা, ওখানে একটা মহামূল্যবান রত্ন পোঁতা আছে। তুমি ঐ রত্ন তুলে নিয়ে যাও। ওতে তোমার দারিদ্র্য ক্লেশ দূর হবে।

কথা কটি বলার পর সনাতন গোঁসাই পুনরায় ইষ্টধ্যানে মগ্ন হলেন।

সনাতনের কথা শুনে জীবন ঠাকুর চলে এলেন নির্দিষ্ট যমুনার তীরে যেখানে পোঁতা ছিল সেই মহামূল্য সোনার দ্রব্যটি।

মাটি খুঁড়ে বের করলেন সেই রত্ন জীবন ঠাকুর। সূর্যের তেজ লেগে সেই রত্ন ঝলকে উঠলো। তাঁর মনে মহা আনন্দ জাগলো সেই রত্ন পাওয়ার ফলে। ভাবলেন, এই রত্ন আমার সংসারের যাবতীয় দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে। আজ আমি কতবড় ভাগ্যবান।

জীবনের এই বাকি দিনগুলি আমার খুব ভালভাবে কেটে যাবে।

এতদিন জীবন ঠাকুরের মনে কোন সুখ ছিল না। এবার তিনি সুখের আলো দেখতে পেলেন। ভাবলেন, আজ ঈশ্বর আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। আজ আমি সত্য ধন্য তাঁর কৃপা লাভ করে।

এরপর সনাতনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন জীবনঠাকুর। কারণ তিনি যে তাঁর কৃপায় এমন অতুল সম্পদের অধিকারী হয়েছেন। দু চোখ তাঁর অশ্রু সজল হয়ে উঠল আনন্দের স্বতস্ফূর্ত বন্যায়।

ক্ষণিক পরে জীবন ঠাকুরের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো একটি কথা চিন্তা করে। সেই কথাটি তাঁর বিবেককে কঠোর ভাবে নাড়া দিলে। কথাটি হচ্ছে, যে রত্নের লোভে শিবাদেশ শিরোধার্য করে তিনি বারাণসী থেকে ছুটে এসেছেন এবং সনাতন গোঁসাইজীর কৃপায় সেই রাজ বাঞ্ছিত অমূল্য রত্ন করায়ত্ত করেছেন অথচ সনাতন নিজে সেই রত্নের অধিকারী হয়েও তাকে মাটির নীচে পুঁতে রাখেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিস্মৃত হয়েছেন সেই রত্নকে।

সুতরাং সনাতন এমন কি মূল্যবান রত্ন লাভ করেছেন যার ফলে তিনি এই রাজবাঞ্ছিত রত্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। তাঁর রত্ন অমৃতময় নিশ্চয়ই। তা না হলে তিনি মহা মূল্যবান রত্নকে উপেক্ষা করে ত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ

DO NOT COPY

করে ধ্যানাবিষ্ট আছেন কেন? আর জীবন ঠাকুর এই ধনের লোভে সুদূর বারানসী থেকে ছুটে এসেছেন বৃন্দাবনধামে। এ তাঁর কি দশা! তিনি কত দীন মানব সনাতন গোঁসাইয়ের তুলনায়।

এভাবে জীবনঠাকুরের মন তোলপাড় করে উঠলো। তিনি ক্ষণিকের জন্যে নিজের মানসিকতা তুচ্ছতা ও দীনতার কথা ভুলে গেলেন। তারপর তিনি সেই মহামূল্যবান রত্নটিকে নিয়ে ফেলে দিলেন সেই যমুনার জলে।

তারপর দ্রুত পদে চলে এলেন মহাতাপস সনাতন গোঁসাইয়ের কাছে। তাঁর কাছে দণ্ডবৎ হয়ে গলদাশ্রু লোচনে বলতে লাগলেন, প্রভু, আমি অত্যন্ত অধম জাতি। আমি নিজের তুচ্ছ ঘর সংসারের মায়ায় আবদ্ধ আছি। দারিদ্র্যের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে অর্থলাভের জন্য ছুটে গেছি বারাণসী ধামে বাবা বিশ্বনাথের কৃপালাভের জন্যে। পরে তাঁর কৃপা লাভ করে এবং তাঁর কথামত বারাণসী থেকে এলুম ব্রজধামে। এখানে আসার পর আপনার কৃপায় আমি যে মূল্যবান রত্ন পেলুম তাতে আমার আনন্দ হয়েছে ঠিক কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে দুঃখও পেয়েছি অপরিসীম। কারণ আপনি এমন ধনে ধনী হয়েছেন সেই ধন দয়া করে আমায় কিছুটা দিন। আজ তাই আমি আপনার কাছ থেকে সেই ধন লাভ করবার জন্যে একান্তভাবে শরণাপন্ন হলুম।

জীবনঠাকুরের মুখে এমন ধরণের কথা শুনে মুগ্ধ হলেন সনাতন। তাঁকে প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবনের পথে পৌঁছে দেবার ভার গ্রহণ করলেন। দীক্ষা দিলেন তাঁকে বৈষ্ণব মন্ত্রে।

কালে জীবন ঠাকুর হয়ে গেলেন একজন প্রকৃত বৈষ্ণব। পরমার্থিক পথের একজন আদর্শ পথিক। উত্তর কালে তাঁর বংশ বিখ্যাত হলো কাথমাহুরায় গোঁসাই পরিবার নামে।

এভাবে আদর্শ বৈষ্ণব ও মহাতাপস সনাতন গোঁসাইয়ের অলৌকিক বিভূতির কৃপার একজন ত্রিতাপদগ্ধ সংসারীর জীবন হয়ে উঠলো আধ্যাত্মিকতার অমৃতস্পর্শানন্দ ঘন বিগ্রহ।

চৌবেজীর কাছ থেকে মদনমোহন বিগ্রহ লাভ করেছেন সনাতন। তিনি তাঁর সাধ্যমত সেই বিগ্রহ সেবা-অর্চনা করতে লাগলেন।

একদিন সেই মদনমোহন স্বপ্নে সনাতনকে দেখা দিয়ে বললেন, তোমার দেওয়া ঐ ভোগ আমি আর খেতে পারি না। তোমার শুকনো পোড়া রুটি অর্থাৎ আভাকড়ি আর সৈন্ধব-মশলাশূন্য আলুনি তরকারি আমার মুখে আর রোচে না।

মদনমোহনের কথা শুনে অশ্রুসজল হয়ে উঠলো সনাতনের দু'নয়ন। তিনি কাতরস্বরে বলতে লাগলেন, প্রভু, তুমি তো জানো, আমি অতি দীন দরিদ্র সেবক। তুমি বিশ্বব্রহ্মান্ডের মালিক। তোমার উপযুক্ত আহার আমি পাবো কোথায়? পোড়া আটা আর এই শাক সেদ্ধ খেতে রুচি না হয় তুমি নিজেই নিজের সেবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে নাও।

কিন্তু মদনমোহন নির্বিকার। তিনি আর কিছু বললেন না। তবে ভক্তের মন পরীক্ষা করতে পেছ-পা হলেন না। সনাতনও মদনমোহনকে তুষ্ট করবার জন্যে দিনরাত চিন্তা করতে লাগলেন। ভাবলেন, আমি দরিদ্র। আমার কি ক্ষমতা আছে মদনমোহনকে উত্তম রূপে ভোগ নিবেদন করার।

নিরন্তর ভক্তের আকুতি ও অশ্রু এক কথায় অন্তরস্পর্শ করলো অন্তর্যামীর। তিনি নিজের ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে এগিয়ে এলেন এক বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে। ঘটনাটি সত্যিই বিচিত্র।

পাঞ্জাবের এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রামদাস কাপুর সেদিন রাতে নৌকোয় করে ব্রজধামের পাশ দিয়ে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিল বহু মূল্যবান রত্ন।

কিন্তু তিনি নির্বিঘ্নে যেতে পারলেন না। হঠাৎ আদিত্য টিলার নীচে সূর্যঘাটের কাছে এসে তাঁর নৌকোটি এক বড় চড়ায় আটকে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে সেটি কাত হয়ে পড়লো।

মাঝি-মাল্লারা বহুক্ষণ ঠেলাঠেলি করে হার মানতে বাধ্য হলো। কিছুতেই মালভর্তি নৌকো সরানো গেল না।

তখন কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত। ব্রজধামের চারদিকে অন্ধকার নেমেছে। নিকটে কোন জনবসতি নেই। এই অবস্থায় রামদাস কাপুর বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ভাবলেন, এখুনি যদি বেশ কয়েকজন লোক পাওয়া যেত তাহলে নৌকোটিকে চড়া থেকে ঠেলে তোলা যেত।

কিন্তু তাঁর আশা দুরাশায় পরিণত হলো।

ওদিকে রাত ক্রমশঃ বাড়ছে। নিকটবর্তী অরণ্যে কোন দস্যুদল থাকাও কিছু বিচিত্র নয়। তারা যদি রত্নভরা নৌকো আক্রমণ করে সর্বস্ব লুট করে তাহলে রামদাসের মাথায় একেবারে বজ্রাঘাত।

বিপদের আশঙ্কা করে ক্ষণ গুণতে লাগলেন রামদাস। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো অদূরে এক টিলায় মৃদু আলোকশিখা।

তাই দেখার পর তাঁর অন্তরে আশার আলো জ্বলে উঠলো। ভাবলেন, ওখানে বোধহয় কোন লোকবসতি আছে। তিনি সাঁতরে নদী পার হলেন। আলোকশিখা লক্ষ্য করে তিনি চলে এলেন এক পর্ণকুটিরে। কুটিরের ভেতরে জ্বলছে একটি দীপ। তার পাশে বসে রয়েছেন একজন বৈষ্ণব সাধু।

সাধুকে দেখামাত্র রামদাস তাঁকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করলেন।

বৈষ্ণব সাধু রামদাসকে দেখা মাত্র উঠে দাঁড়ালেন।

রামদাস তাঁকে নিজের বিপদের কথা জানালেন।

তারপর কাতর কণ্ঠে মিনতিভরা বচনে বলতে লাগলেন, মহারাজ, আজ আমি বড় বিপন্ন। যমুনার গর্ভে আমার সর্বস্ব খোয়াতে বসেছি। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আপনি আমাকে এই বিপদ হতে বাঁচান।

সনাতনের মন গলে গেল রামদাসের আকুল আবেদনে। তিনি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, বাবা তুমি শান্ত হও। অত অধীর হয়ো না। মদন গোপালজী তোমায় কৃপা করবেন। তুমি এই বিপদ হতে মুক্ত হবে। যাও তুমি নির্ভয়ে যমুনার তীরে অপেক্ষা করো।

আশীর্বাদ ও অভয় লাভ করার পর রামদাসের অন্তর খানিকটা শান্ত হলো। তিনি বৈষ্ণব সাধুকে উদ্দেশ্য করে করজোড়ে বলতে লাগলেন, মহারাজ, আমি সঙ্কল্প করলাম, আমি বিপদ থেকে রক্ষা পেলে এবারকার বাণিজ্যের সব মুনাফা আপনার এই দেববিগ্রহের সেবায় নিয়োজিত করবো।

সেদিন রাতে দেখা গেল মহাতাপস সনাতন গোস্বামীর অলৌকিক বিভূতির লীলা। কোথা থেকে এক নতুন জলস্রোত এসে চড়ায় আটকানো রামদাসের নৌকো ভাসিয়ে নিয়ে চললো।

রামদাস নিরাপদে আগের মত তার পণ্যবাহী নৌকো নিয়ে যাত্রা করলো।

বাণিজ্য থেকে সফলকাম অবস্থায় ফিরে এসে রামদাস কাপুর সোজা চলে এলেন বৃন্দাবনে। মহাতাপস সনাতন গোঁসাইয়ের অলৌকিক বিভূতির লীলায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে সস্ত্রীক দীক্ষা নিলেন।

এছাড়া পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত সেবারকার বাণিজ্যের পুরো লভ্যাংশটুকু উৎসর্গ করলেন মদনমোহনের সেবায়।

কাপুরের সেই অর্থ দিয়ে বানানো হলো মদনমোহনের সুন্দর মন্দির, জগমোহন এবং নাটমন্দির। তার সঙ্গে কেনা হলো প্রচুর ভূ-সম্পত্তি। সেই সম্পত্তির আয় হতে চালানো হতে লাগলো বিগ্রহের সেবা-পুজোর সমস্ত রকম ব্যয়ভার।

আজকের বাংলা সাহিত্য ও স্বামী বিবেকানন্দ **ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

প্রশ্ন- দেখুন, সাহিত্য নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে ধর্ম টর্ম নিয়ে মাথা ঘামানো কি ঠিক?

উত্তর- আপনি বুঝি প্রবন্ধের শিরোনামটি লক্ষ্য করেছেন?

প্রশ্ন- আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনি প্রশ্নেই জবাব দিলেন, কিন্তু মূল বক্তব্যের ধার দিয়ে গেলেন না।

উত্তর- বক্তব্য কিছু থাকলে অবশ্যই যাবো। আগে দেখতে হবে আপনার প্রশ্নে কোন বক্তব্যের সন্ধান মেলে কিনা? আপনি বলছেন, যা ধর্ম তা সাহিত্য নয়। নিশ্চয় সাহিত্যই যে কারো ধর্ম হতে পারে, একথায় আপনার আপত্তি নেই। কিন্তু ধর্ম সাহিত্য হয়েছে কি না সেই বিষয়ে আপনার সন্দেহ। এখানে সাহিত্যের ধারণা আপনার কি, তাই আগে স্পষ্ট হোক।

প্রশ্ন- সাহিত্যের অর্থ কি জীবন নয়?

DO NOT COPY

উত্তর- জীবনের অর্থ?

প্রশ্ন- যা আমরা দেখতে পাই, বুঝতে পারি, জানতে পারি তাই জীবন।

উত্তর- অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ ছাড়া যা ধরা পড়ে না, তাকে কি খালিচোখে দেখতে পান? দশবছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কি বুঝতে পারতেন? জ্ঞান বিজ্ঞানের যত শাখা প্রশাখা আছে তার সবই জানতে ও বুঝতে পারেন?

প্রশ্ন- কোন রকম অলৌকিকতা বা অনুমানের আশ্রয় না নিয়ে যে জীবনবোধের সৌন্দর্য লেখকের রচনায় ফুটে ওঠে তাই সাহিত্য নয় কি?

উত্তর- অলৌকিক বা অনুমান বলতে আপনার কাছে যা বোঝায়, আর একজনের কাছে কি তা বোঝায়? জুল ভার্ণের উপন্যাসের অনুমানগুলি আজ কতো বাস্তব, তা তো দেখাই যাচ্ছে। আর সাধারণ ইন্দ্রিয়ধারণার অতীত হলেই যদি অলৌকিক হয়, তাহলে তো বিশ্বের তাবৎ মহাপুরুষের কথাই খারিজ! সেক্ষেত্রে উপনিষদের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' থেকে রামকৃষ্ণদেবের 'মানুষ তাঁর বিশেষ প্রকাশ' এই সবের কোনো অর্থই নেই। যদি সে সব চিন্তা অলীকই হয়ে থাকে, তাহলে আপনার আমার কিছু এসে যায় না, একদিন আপনিই ওসব ভ্রান্তি মানুষের ঘুচে যাবে। আর যদি বেদ পুরাণ কোরাণ বাইবেলের কথায় বিশ্বাস থাকে তাহলে দেখবেন মানুষের সূক্ষতম অনুভূতির অপূর্ব বাঙময় প্রকাশ পৃথিবীর সব ধর্মশাস্ত্রেই কম বেশী আছে। আবার যুগে যুগে এই সব ধর্মসাধনার প্রেরণায় কত কবি, কত লেখক শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির উদাহরণ রেখে গেছেন। তার কারণ একটি বিশেষ স্তরে এসে ধর্ম যখন অনুভূতির মতোই সাহিত্যের প্রেরণা-অনেক সময় শ্রেষ্ঠ প্রেরণা। অর্থ ও কাম যদি জীবন হয়, তাহলে ধর্ম ও মোক্ষও সেই জীবনবোধেরই আর এক প্রকাশ। সাহিত্যই যদি হয়ে থাকে, তাতে জীবনের সব চেতনার প্রকাশ থাকবে।

প্রশ্ন- আচ্ছা, বিবেকানন্দের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক কি?

উত্তর- আপনি স্বামিজীর রচনাবলী সম্বন্ধে কী খবর রাখেন, জানতে ইচ্ছা করে।

প্রশ্ন-কিছু খবর না রেখেই কি বলছি? স্বামিজীর চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, দেববাণী, ভারতে বিবেকানন্দ এসব তো পড়েছি।

DO NOT COPY

উত্তর- এগুলি অবশ্য সবই ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ। মূল বাংলা রচনা কি পড়েছেন?

প্রশ্ন- বাংলাভাষা সম্বন্ধে তাঁর একটি প্রবন্ধ পড়েছি। আর 'সুয়েজ খালে' নামে একটি ভ্রমণকাহিনী যেন পড়েছিলাম। তাছাড়া 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার' ইত্যাদি যে স্বামিজীরই রচনা তা আর কে না জানে?

উত্তর-সামান্য কিছু কিছু আপনি পড়ছেন বটে। কিন্তু তাঁর সব বাংলা রচনা আপনি পড়েন নি। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর কী ধারণা, সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি কী বলে গেছেন-এসব কখনো খুঁটিয়ে দেখেছেন?

প্রশ্ন-স্বামিজী যা লিখেছেন সবই তো ধর্ম, তার মধ্যে সাহিত্য কোথায়?

উত্তর-বাংলায় তিনি যে কটি বই বা প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে ধর্ম আনুষঙ্গিক বিষয় বটে, কিন্তু ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, স্বদেশচেতনা, ভ্রমণকাহিনী, রসরচনা- এই জাতীয় অনেক ধরণের বিষয় নিয়েই তিনি লিখেছেন। আপনি তাঁর সে জাতীয় রচনাগুলিতে মন দেবার সময় পান নি। কিন্তু স্বামিজী লিখেছেন বলেই তা ধর্ম বিষয়ক হবে, এমন কথা তাঁর বই না পড়েই বলা বোধ ঠিক নয়।

প্রশ্ন-কিন্তু স্বামিজী কি তাঁর বেশির ভাগ লেখায় ও বক্তৃতায় ধর্মের উপরেই জোর দেন নি?

উত্তর- তা দিয়েছেন, কিন্তু যা লিখেছেন তাই যে ধর্মসংক্রান্ত বিষয় তা নয়। ধর্মের এক বিশেষ ধারণা তাঁর জীবনদর্শন। সে জীবন দর্শন তাঁর লেখায় ফুটবে বৈকি! তাঁর মৌলিক বাংলা রচনাগুলিতে নানা বিষয়েই তিনি আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত ধর্মের কথাও এসেছে।কিন্তু যেমন ধরুন তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী 'পরিব্রাজক'। এই বইয়ের মূলে রয়েছে দেশ বিদেশে ভ্রমণের সরল আনন্দময় উপলব্ধি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব ইতিহাসের নানা উপকরণ। বাংলা সাহিত্য এমন খোশমেজাজী ভ্রমণ কাহিনী আর আছে কি না সন্দেহ, কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিগূঢ় এমন বহু কথা এ ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যেই সহজ ভাবে ফুটে উঠেছে যে স্বামিজীর মনীষা ও ভুয়োদর্শনে চমৎকৃত না হয়ে উপায় নেই। আপনি যে 'সুয়েজ খালে' রচনাটির কথা বলছিলেন সেটি ঐ বইয়েরই অংশমাত্র।

প্রশ্ন- 'পরিব্রাজক' নামে যে এত ভালো একটি বই আছে, তা অবশ্য জানা ছিল না। কিন্তু ধরুন স্বামীজীর 'ভাববার কথা' নামে একটি বইয়ের মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে প্রবন্ধ আছে। এ জাতীয় ভক্তিবাদী মনোভাব নিয়ে কি সাহিত্যিক হওয়া চলে?

উত্তর- 'ভাববার কথা' 'উদ্বোধনে' অন্য পত্রিকায় অথবা পুস্তিকার আকারে লেখা প্রবন্ধের সংকলন। আপনি যে 'বাংলাভাষা' প্রবন্ধটির কথা বলছিলেন, ওটি উদ্বোধনের সম্পাদককে লেখা স্বামীজীর চিঠি। 'ভাববার কথায়' রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ রয়েছে। সে দুটি প্রবন্ধে ভারত ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাবের তাৎপর্য এবং ম্যাক্সমুলারের রামকৃষ্ণজীবনীর আলোচনা রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র অনুধ্যানে বিবেকানন্দের চেয়ে যোগ্যতর আর কার কথাই বা ভাবা চলে? কিন্তু এও কি আশ্চর্য নয় যে, তাঁর বাংলা ও ইংরাজী রচনায় গুরুবন্দনা সবচেয়ে কম? আর উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধকব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এতো সান্নিধ্যে থেকেও যদি স্বামীজী কিছুই তাঁর সম্বন্ধে না লিখতেন, তাই কি অস্বাভাবিক হতো না? বাস্তবিক ধর্ম বলতে তিনি যা বুঝতেন শ্রীরামকৃষ্ণ তো তারই বাণীমূর্তি? শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বুঝতে হলে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীসংগ্রহই শ্রেষ্ঠ সহায়ক। সে যাই হোক এমন একজন সাধক শ্রেষ্ঠের সম্বন্ধে স্বামীজীর উপলব্ধি ও লিখিত মন্তব্যের মূল আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষভাবেই চিন্তণীয়।

কিন্তু এর চাইতে বড়ো কথা-বাংলাসাহিত্যে ভাষাবাহনরূপে চলতিভাষাকে বিশেষভাবে নির্বাচন তো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাসৌন্দর্য থেকেই বিবেকানন্দমানসে সঞ্চারিত। বাংলা চলতি গদ্যের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের রচনা নৈপুণ্যের মূলে শ্রীরামকৃষ্ণেরই প্রেরণা। যেমন বুদ্ধকথা অবলম্বনে পালিসাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ কথা অবলম্বনে চলিত বাংলার নৈপুণ্য সবচেয়ে সার্থকভাবে দেখা দিয়েছিল বিবেকানন্দের রচনায়।

প্রশ্ন- কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব তো সাহিত্যিক নন, তিনি তো খালি বলে গেছেন।

উত্তর-সেই বলায় যদি সাহিত্যগুণ থাকে? বাইবেল বলুন, সক্রেটিসের সংলাপ বলুন, জনগণের কথোপকথন বলুন-এ সব কি সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নি? গ্যয়টের আলাপচারী বা রবীন্দ্রনাথের যেটুকু ভগ্নাংশ আমরা মৈত্রেয়ী দেবী বা

রাণীচন্দ্র প্রমুখের কল্যাণে পেয়েছি? রামকৃষ্ণদেবের কথা সৌন্দর্যও সেই অর্থে সাহিত্য। তার চেয়ে বেশি কিছু তো বটেই।

প্রশ্ন- ব্যক্তিগত ভিত্তিতে রচিত লেখাকে কি সাহিত্য বলবো?

উত্তর-যদি তা সাহিত্য হয়ে থাকে তবে আর ব্যক্তিগত নেই। খুব সম্প্রতি পরলোকগত হয়েছেন পন্ডিচেরীতে কবি নিশিকান্ত। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্তিরসের কবি। তাঁর ভক্তি ব্যক্তিগত তো বটেই, কিন্তু তা সাহিত্য বলেই আজ সবার সম্পদ। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে একথা আরও বৃহৎ পটভূমিকায় স্থাপন করা চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু তাঁর বা তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের আরাধিত নয়, সারা বিশ্বের সাধক ও মনীষীদের মননের বিষয়।

প্রশ্ন- কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে আজকের মানুষের আর সে আগ্রহ নেই। মানুষ চায় বাস্তব জীবনসমস্যার সমাধান। তাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চিন্তাধারা নিয়ে মাথা ঘামাবার তার প্রয়োজন নেই, আধুনিক জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের যোগই বা কোথায়?

উত্তর- এ কথার জবাব দেওয়ার আগে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সংগ্রহ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত পাঁচ খন্ড আপনি পড়েছেন কিনা – অন্ততঃ ওই বইগুলির সঙ্গে আপনার একটি মোটামুটি পরিচয় আছে কিনা সে কথাটি জানা দরকার। দুজনের রচনা ও কথার সঙ্গেই আপনার সামান্য পরিচয়। তবু ঐ সামান্য পরিচয়ই আপনার মনে কী ধরণের সাড়া জাগিয়েছে, সেটি অন্ততঃ বুঝিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করুন।

প্রশ্ন- বিবেকানন্দের লেখা বা বক্তৃতায় সবার আগে মনে লাগে তাঁর তেজ ও পৌরুষ। আর রামকৃষ্ণদেবের সরল কথায় শ্রেষ্ঠ তত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতায় মুগ্ধ হই। কিন্তু সেজন্যই কি তাদের সাহিত্য বলতে হবে?

উত্তর-এ কথার উত্তর দ্বিতীয়বার দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অনুভব, প্রকাশভঙ্গী, শব্দসুষমা, চিত্রসৌন্দর্য, প্রেরণাশক্তি- এসব কিছুর মিলনে যদি সাহিত্য না হয় তো সাহিত্য আর কাকে বলে আপনিই বুঝিয়ে বলুন। এঁদের দুজনের লেখায় ও বলায় যে সাহিত্যগুণ রয়েছে, তা বিশদভাবে না পড়েও যদি কিছু বোঝা যায়, তাহলে ভালোভাবে পরিচিত হলে সে সম্বন্ধে কত স্পষ্ট ধারনাই হবে।

প্রশ্ন–আচ্ছা, না হয় সাহিত্যই হলো। কিন্তু এখানে ওসব সাহিত্যের দরকার কি?
উত্তর– দরকার জিনিসটা কার এবং কোন যুগের তার উপরে নির্ভরশীল। আমারতো মনে হয় বিবেকানন্দ সাহিত্যের চর্চা এযুগেই সবচেয়ে বেশী দরকার। আপনার আমার জন্যই দরকার।
প্রশ্ন– কেন?
উত্তর– দেখুন, সবার আগে মনে রাখতে হবে, মানুষের প্রতি ভালোবাসাই সব সাহিত্যের প্রাণ। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বে ও রচনায় সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও মানুষের মহিমায় তাঁর বিশ্বাস। সন্দেহ নেই, তাঁর অদ্বৈত দৃষ্টিই সর্বজীবে নারায়ণজ্ঞান এনে দিয়েছে। তবু সে দৃষ্টি দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, এমন কি চর, অসাধু, চরিত্রহীন– সবার প্রতি এক গভীর মমতায় (তাঁর রচনা ও বাণী) পরিপূর্ণ। জীবনকে এমন সম্পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখাই বাস্তবতা।

সুখ ও সৌন্দর্য যেমন জীবনের অনিষ্ট, দুঃখ ও বিকৃতি তেমনি জীবনের অঙ্গ। বিবেকানন্দের বিপুল বেদনা বোধ তাঁকে দুঃখ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে শিখিয়েছে। আজকের দিনে যে বাস্তব দুঃখদৈন্য বিকৃতির কথায় সাহিত্য পরিপূর্ণ, বিবেকানন্দ সমস্ত হৃদয় দিয়ে তার যন্ত্রণা বরণ করে নিয়েছেন, কিন্তু কোনো শূন্যতাবোধের শিকার হননি। প্রতিদানহীন সেবা ও কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে দুঃখমৃত্যুর মুখোমুখি হওয়াই তাঁর জীবনাদর্শ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মূল জীবন সমস্যা তিনি প্রণিধান করেছেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিচারে এ দুই সভ্যতার মানদণ্ড। ভারতবর্ষের দিনক্ষণগত ইতিহাস নয়, সমাজবিজ্ঞানসম্মত বিবর্তনের মূল সূত্রটি আবিষ্কার করেছেন 'বর্তমান ভারতে'। ভারতের জড়তা, আলস্য, নিশ্চেষ্ট বিকৃত মনোভাবকে তীব্রতম আঘাত করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে আহ্বান করেছেন বার বার। সেই সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক মনীষার পরম সার্থকতার কথা শুনিয়েছেন বিশ্ববাসীকে। কিন্তু যে যেখানেই থাকুক 'আগে মানুষ হও'–'Manliness'– এই উদ্বোধনীমন্ত্রে জাগ্রত করতে চেয়েছেন মানুষের অন্তর্নিহিত সিংহসত্তাকে।

আজকের বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষের কি স্বামীজীকেই সবচেয়ে বেশী দরকার নয়? যা বাস্তব, যা বেদনা, যা মৃত্যু তার মুখোমুখি হয়েই সত্যকে পেতে হবে, এই যদি আধুনিক সাহিত্যের বক্তব্য হয়, তবে বিবেকানন্দের সাহিত্যই তার সূচনা।

অথচ উপদেশ, অনুশাসন, পান্ডিত্য বিস্তার-এ সব কোনো কিছুই নয়- পাঠকের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে কখনো একেবারে ঘরোয়া কথায়, কখনো সংহত বাণীভঙ্গীর মন্ত্রমহিমায় বাংলাভাষাকে তিনি ধ্রুপদী ও আধুনিক দুই চালেই আশ্চর্যভাবে খেলিয়ে গেলেন। একদিকে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' অন্যদিকে 'বর্তমান ভারত', আবার 'ভাববার কথা'র সেই অনবদ্য টুকরো টুকরো রসরঙ্গ। সবার উপরে তাঁর 'পত্রাবলী', জীবনের কোন অতল্ গভীরে তিনি ডুব দিয়েছিলেন, কী মন্ত্রবলে দেশবাসীকে জাগিয়েছিলেন, আবার বিশ্বজনের কল্যাণে কেমন করে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করেছিলেন- সে সব কথাই তাঁর 'পত্রাবলী'র অন্তরতম লেখনভঙ্গিমায় প্রকাশিত।

আজকের কজন লেখক জীবনের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে পরিচিত? ইন্দ্রিয়গত আলোড়নের বাইরে বুদ্ধি বোধ অনুভবের যে বিরাট জগৎ রয়েছে কজনে তার খবর রাখেন? কজনের রচনায় মানুষ হারানো আত্মসম্বিৎ ফিরে পায়, জীবনে পথের সন্ধান পায়? আমরা যা ভাবি, সাহিত্যের কাজ সাহিত্যের সংবাদ তার চেয়ে ঢের বড়ো।

রামকৃষ্ণদেবের কাছেই বিবেকানন্দ সেই কুয়োর ব্যাঙের গল্প শুনেছিলেন, যার কাছে তার কুয়োটির চেয়ে বড়ো জলাশয় জগতে অসম্ভব। সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে সেই কুয়োর ব্যাঙের ধারণাটি পালটানো দরকার। সবার আগে দরকার কোনো রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করার আগে সে রচনাটি আদ্যোপান্ত পাঠ করা।

পার্থসারথির প্রতি

প্রণব রায়

তুমি বলেছিলে, এ বসুন্ধরা পাপে ভ'রে যাবে যবে,
সেদিন আবার নবরূপ ধ'রে তোমারি প্রকাশ হবে।
সকল পাপের গ্লানি হবে দূর,
বিনাশিবে তুমি দানব-অসুর,
পতিত আত্মা জাগিবে তোমার পাঞ্চজন্য-রবে।
ধর্মরাজ্য স্থাপনের তরে তোমারি প্রকাশ হবে।।

গীতা-উদ্‌গাতা! বলেছিলে তুমি আবার আসিবে ফিরে
মুক্ত করিতে পাপ-কবলিত কলুষিত পৃথিবীরে।
তোমার সে-বাণী ভোলে নি ভারত,
সেই বিশ্বাসে চেয়ে আছে পথ,
পার্থসারথি! তোমার প্রকাশ যুগে যুগে সম্ভবে।
পীড়িত মানব উদ্ধার তরে তোমারি উদয় হবে।।

দ্বাপর যুগের অর্জুন-সখা! আজ দেখে যাও তুমি
মানবের নয়, দানবের দেশ হয়েছে ভারতভূমি।
দেশ জুড়ে তাই এত দুস্কৃতি,
এত অধর্ম, এত দুর্নীতি,
সৎ মানুষের স্বর্গ কি আজ অমানুষ কেড়ে লবে?
হারানো স্বর্গ ফিরে দিতে পুন তোমারি প্রকাশ হবে।।

স্বর্গভ্রষ্ট কাতর আত্মা করে ওই ক্রন্দন,
সৎ ও অসতে, ন্যায়-অন্যায়ে কুরু-পাণ্ডব রণ।
প্রেমহীন প্রাণে কত সংশয়,
এ জীবন তাই দুর্গতিময়,
তোমার আসার পরম লগ্ন সার্থক হবে কবে?
তিমির-বিদায় সবিতার মতো তোমার উদয় হবে।।

DO NOT COPY

পার্থসারথি! রূপ ধ'রে তুমি আজিও নাই বা এলে,
'পার্থসারথি' পত্রিকা মাঝে তোমারি ত' দেখা মেলে।
তোমার নামের পত্রিকাখানি
শোনায় তোমারি অমৃতের বাণী,
তোমার মহান আবির্ভাবের সাড়া পাই অনুভবে।
তুমি ছাড়া মোর জীবন-রথের সারথী কে আর হবে?

নববর্ষের কথা **সুনন্দন ঘোষ**

অতিমারিতে আর্ত পৃথিবী।
দীর্ঘ গৃহ-বন্দীত্বের পর একটু আকাশ দেখতে চেয়েছিল সবাই।
কর্মহীন মানুষেরা নতুন করে বাঁচার রসদ চাইছিল।
খুলছিল জীবন-মুখী দরজাগুলো।

অনুশাসনের দোহাই দিয়ে শুরু হল সঙ্ঘাত রাজদণ্ড হাতে তুলে নেওয়ার।
হুইল চেয়ারের চাকা আর হেলিকপ্টারের পাখা উড়িয়ে নিয়ে গেল
অনেক মৃত্যুর বিনিময়ে গড়ে তোলা সতর্কতা –
মাস্ক, স্যানিটাইজার, সোশ্যাল ডিস্টান্সিং।

যে মানুষ কোভিড-১৯ এর ভয়ে ঘরে লুকিয়েছিল,
আততায়ীর বুলেট দরজার বাইরে থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।
নাগরিক অধিকারের প্রথম প্রয়োগ করতে গিয়ে
ঘরে ফিরল না আঠার বছরের তাজা প্রাণ।
দেশ জুড়ে যখন অতিমারীর পুনরাবৃত্তি,
নীতিহীন বাক্যবিলাসীরা তখন মিথ্যার জাল বোনায় ব্যস্ত।

আমাদের অস্ত্র নেই, ধৈর্য আছে।
অর্থ নেই, শ্রম আছে।
রক্তচক্ষু উপেক্ষা করার শক্তি নেই,
দিন বদলের সঙ্কল্প আছে।

DO NOT COPY

আমরা পরিবর্তন করতে পারি,
আমরা পরিবর্তিতের পরিবর্তন করতে পারি,
আমরা পরিবর্তিতের পরিবর্তনের পরিবর্তন করতে পারি।

একটু সময় লাগে।
আমরা মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও নিজস্ব সত্যের
উত্তরাধিকার যোগ্য হাতে তুলে দিতে পারি।

<u>আমাদের কথা</u> ::

বিশ্বব্যাপী অতিমারীর দুর্যোগে যখন দেশজুড়ে দীর্ঘস্থায়ী লকডাউন, তখন ৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী বাংলা মাসিক পত্রিকা পার্থসারথির প্রকাশকে নিরবচ্ছিন্ন রাখার তাগিদ থেকে শুরু হয় অন্তর্জাল সংখ্যা। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুসারে কলকাতা জিপিও থেকে পার্থসারথির মুদ্রিত সংখ্যা শেষ বারের মতো পোস্ট হয়েছিল ১৩ই মার্চ, ২০২০তে।

এই প্রকৌশলী প্রজন্মের যুবক পরজ আলির (প্রতিষ্ঠানঃ কলরব স্পাইডার) ক্লান্তিহীন সহযোগিতায় লকডাউনের কঠিন দিনগুলোয় সকলে গৃহবন্দী থেকেও বৈদ্যুতিন যোগাযোগের মাধ্যম আর যৎপ্রয়োজনীয় পরিগণক শিক্ষাকে অবলম্বন করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পার্থসারথির প্রথম মাসিক অন্তর্জাল সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ২৪শে এপ্রিল, ২০২০তে।

২৪শে এপ্রিল, ২০২১ থেকে পত্রিকার বৈদ্যুতিন সংখ্যার দ্বিতীয় বর্ষের সূচনা। শ্রীমতী সোমা ঘোষের ঐকান্তিকতায় প্রতিবার নির্ধারিত সময়েই বিকশিত হয় পত্রিকার অবয়ব।

আমাদের সাধ্য কম, সাধনা বেশী। পরম কারুণিক শ্রী পার্থসারথির কৃপা ও গীতারত্ন শ্রীপ্রীতিকুমারের আশীর্বাদ নিয়ে অনিবার হোক পার্থসারথির জয়যাত্রা।